গন্ধমাদন-বৈঠক

পরশুরাম

পুরাণে সাত জন চিরজীবীর নাম পাওয়া যায়— অশ্বত্থামা বলির্ব্যাসো হনুমাংশ্চ বিভীষণ কৃপঃ পরশুরামশ্চ সপ্তৈতে চিরজীবিনঃ। এঁরা একবার একত্র হয়েছিলেন।

বদরিকাশ্রমের উত্তর-পূর্বে গন্ধমাদন পর্বত। বনবাসে ভীম যখন দ্রৌপদীর উপরোধে সহস্রদল পদ্ম আনতে যান তখন গন্ধমাদনে হনুমানের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল। রামচন্দ্রের স্বর্গারোহণের পর থেকে হনুমান সেখানেই বাস করছেন।

একটি প্রকাণ্ড অক্ষোট অর্থাৎ আখরোট গাছের নীচে অপরাহ্ণে হনুমান বার দিয়ে বসেন। সেই সময় নিকটবর্তী অরণ্যের আধিবাসী বহুজাতীয় বানর ভল্লুক প্রভৃতি বুদ্ধিমান প্রাণী তাঁকে দর্শন করতে আসে। হনুমান নানাপ্রকার বিচিত্র কথা বলেন, তাঁর ভক্তেরা পরম আগ্রহে তা শোনে।

একদিন হনুমান অক্ষোটতরুতলে সমাসীন হয়ে ভক্তবৃন্দের বিবিধ প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন এমন সময় জাম্ববানের বংশধর একটি বৃদ্ধ ভল্লুক করজোড়ে বললে, প্রভু, আপনার লঙ্কাদাহনের ইতিহাসটি আর একবার আমরা শুনতে ইচ্ছা করি।

হনুমান বললেন, সাগরলঙ্ঘন করে লঙ্কায় গিয়ে দেবী জানকীর সঙ্গে দেখা করার পর আমি বিস্তর রাক্ষস বধ করেছিলাম। তার পর ইন্দ্রজিৎ ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করে আমাকে কাবু করে ফেললেন। তখন রাক্ষসরা শণ আর বল্কলের রজ্জু দিয়ে আমাকে বেঁধে রাবণের কাছে নিয়ে চলল। আমি ভাবলাম, এ তো মজা মন্দ নয়, বিনা চেষ্টায় রাবণের সঙ্গে আমার দেখা হয়ে যাবে—

এই পর্যন্ত বলার পর হনুমান দেখলেন, একজন নিবিড়শ্যামবর্ণ দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ পুরুষ লম্বা লম্বা পা ফেলে তাঁর কাছে আসছেন। সভায় যারা উপস্থিত ছিল সকলেই নিমেষের মধ্যে নিকটস্থ অরণ্যে অন্তর্হিত হল। আগন্তুক হনুমানের কাছে এসে নমস্কার করে বললেন। মহাবীর,আমাকে চিনতে পার?

হনুমান উৎফুল্ল হয়ে বললেন, আরে, এ যে দেখছি লঙ্কেশ্বর বিভীষণ! বহু বৎসর পরে দেখা হল। মহারাজ, সমস্ত কুশল তো? লঙ্কা থেকে কবে এসেছ? এখানে আছ কোথায়?

বিভীষণ বললেন, কাল এসেছি। বদরিকাশ্রমে আমার পত্নীকে রেখে তোমাকে দেখতে এলাম। সমস্ত কুশল, তবে আমার লঙ্কারাজ্য আর নেই।

—সেকি? সিংহল তো রয়েছে।

—সিংহল লঙ্কা নয়, লোকে ভুল করে। লঙ্কা সাগরগর্ভে বিলীন হয়েছে। আমি এখন নিষ্কর্মা, রাজ্যহীন হয়ে ছদ্মবেশে নানা স্থানে ঘুরে বেড়াই, কোনও স্থায়ী আবাস নেই, মহেশ্বর আর রামচন্দ্রের কৃপায় কোনও অভাব নেই। রাজ্য গেছে তাতে ভালই হয়েছে, আজকাল রাজাদের বড় দুর্দিন চলছে।

—বটে! পৃথিবীর আর সব খবর কি বল। লোকে রামচন্দ্রের কীর্তিকথা ভুলে যায় নি তো?

—ভুলে যায় নি, তোমার খ্যাতিও রামচন্দ্রের চাইতে কম নয়, কিন্তু বাংলাদেশে অন্য রকম দেখেছি।

—কি রকম?

—সেখানকার লোকে রামের প্রতি মৌখিক ভক্তি দেখায়, ভূত তাড়াবার জন্য রাম রাম বলে, কিন্তু তাঁর পূজা করে না, কেউ কেউ তাঁর নিন্দাও করে। সবচেয়ে দুঃখের কথা, তোমাকে তারা বিদ্রুপ করে। একনিষ্ঠ প্রভুভক্তি আর অলৌকিক বীরত্বের মহিমা বোঝাবার শক্তি বাঙালীর নেই।

—তোমার কথা কি বলে?

—সে অতি কুৎসিত কথা। আমাকে বলে— ঘরভেদী বিভীষণ। জয়চাঁদ, মীরজাফর, লাভাল আর কুইসলিং-এর দলে আমাকে ফেলেছে। ন্যায় আর ধর্মের জন্যই আমি ভ্রাতাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছি তা কেউ বোঝে না।

এই সময় আর একজন সেখানে উপস্থিত হলেন। দীর্ঘ শীর্ণ মলিন দেহ, মাথায় জটা, এক মুখ দাড়ি-গোঁফ, পরনে চীরবাস, গায়ে কর্কশ কম্বল। এককালে বলিষ্ঠ ও সুপুরুষ ছিলেন তা বোঝা যায়। আগন্তুক বললেন, মহাবীর হনুমান আর রাক্ষসরাজ বিভীষণের জয় হোক।

হনুমান বললেন, কে আপনি সৌম্য? ব্রাহ্মণ মনে হচ্ছে, প্রণাম করি।

—না না প্রণাম করতে হবে না। আমি ভরদ্বাজের বংশধর দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা, কিন্তু ভাগ্যদোষে পতিত হয়েছি।

হনুমান বললেন, অশ্বত্থামা নাম শুনেছি বটে। দাঁড়িয়ে রইলে কেন, বস এখানে। কোন্ পাপে তোমার পতন হল?

—সে অনেক কথা। পাণ্ডবরা জঘন্য কপট উপায়ে আমার পিতাকে বধ করেছিল, তারই প্রতিশোধে আমি দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র আর ধৃষ্টদ্যুম্নকে সুপ্ত অবস্থায় হত্যা করেছিলাম, পাণ্ডববধূ উত্তরার গর্ভে দারুণ ব্রহ্মশিরঅস্ত্র নিক্ষেপ করেছিলাম। তাই কৃষ্ণ আমাকে শাপ দিয়েছিলেন— নরাধম, তুমি তিন সহস্র বৎসর জনহীন দেশে অসহায় ব্যাধিগ্রস্ত ও পুষশোণিতগন্ধী হয়ে বিচরণ করবে। সেই শাপের কাল অতিক্রান্ত হয়েছে, এখন আমি ব্যাধিমুক্ত, ইচ্ছানুসারে সর্ব জগৎ পরিভ্রমণ করি। কিন্তু আমার শান্তি নেই, মন ব্যাকুল হয়ে

আছে। এখন আমার বার্তা শুনুন। ভগবান পরশুরাম আমাকে আজ্ঞা করেছেন, বৎস, সপ্ত চিরজীবী যাতে গন্ধমাদন পর্বতে সমবেত হন তার আয়োজন কর। দৈবক্রমে বিভীষণ এখানে এসে পড়েছেন আমরা তিনজন একত্র হয়েছি, অবশিষ্ট চার জনকে আমি আহ্বান করেছি। ওই যে, ওঁরাও এসে গেছেন।

জমদগ্নিপুত্র পরশুরাম, মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস বিরোচনপুত্র দৈত্যরাজ বলি, এবং অশ্বত্থামার মাতুল কৃপ উপস্থিত হলেন। হনুমান সসম্ভ্রমে নমস্কার করে বললেন, আজ আমার জন্ম সফল হল, বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার ভগবান পরশুরাম আমার আশ্রয়ে পদার্পণ করেছেন, তাঁর সঙ্গে মহাজ্ঞানী মহর্ষি ব্যাস, দানশৌণ্ড মহাকীর্তিমান বলি, এবং সর্বাস্ত্রবিশারদ কৃপাচার্যও এসেছেন। আরও সৌভাগ্য এই যে বহুকাল পরে আমার মিত্র বিভীষণের দর্শন পেয়েছি এবং দ্রোণপুত্র মহারথ অশ্বত্থামাও উপস্থিত হয়েছেন। আমরা সপ্ত চিরজীবী সমবেত হয়েছি, এখন শ্রীপরশুরাম আজ্ঞা করুন আমাদের কি করতে হবে।

পরশুরাম বললেন, তোমরা বোধ হয় জান যে বসুন্ধরার অবস্থা বড়ই সংকটময়। ধর্ম লুপ্ত হয়েছে। সমস্ত প্রজা যুদ্ধের ভয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে আছে। শুনেছি দু-চার জন নীতিশাস্ত্রজ্ঞ ধর্মযুদ্ধের নিয়ম বন্ধনের চেষ্টা করছেন কিন্তু পেরে উঠছেন না। আমরা এই সপ্ত চিরজীবী অনেক দেখেছি, অনেক শুনেছি, অনেক কীর্তি করেছি। মহর্ষি ব্যাসের রসনাগ্রে সমস্ত পুরাণ আর ইতিহাস অবস্থান করছে। দৈত্যরাজ বলি ইন্দ্রকে পরাস্ত করেছিলেন, অসংখ্য সৈন্য পরিচালনার অভিজ্ঞতা এ'র আছে। কৃপাচার্য কুরুক্ষেত্র সমরে অশেষ পরাক্রম দেখিয়েছেন কিন্তু কদাচ ধর্মবিরুদ্ধ কর্ম করেন নি। বিভীষণ আর অশ্বত্থামা দুজনেই মহারথ, অধিকন্তু সমস্ত পৃথিবীর সংবাদ রাখেন। পবনন্দন হনুমান চরিত্রগুণে এবং প্রভুভক্তিতে অদ্বিতীয়। আর আমার কীর্তি তোমরা সকলেই জানো, নিজের মুখে আর বলতে চাই না। এখন আমাদের কর্তব্য সাত জনে মন্ত্রণা করে এই দারুণ কলিযুগের উপযুক্ত ধর্মযুদ্ধের নিয়ম বেঁধে দেওয়া।

দৈত্যরাজ বলি বললেন, আপনারা কিছু মনে করবেন না, আমি কিঞ্চিৎ অপ্রিয় সত্য নিবেদন করছি। এই ব্যাসদেব ছাড়া আমরা সকলেই এক কালে অসংখ্য বিপক্ষ বধ করেছি। আমরা কেউ ধর্মযুদ্ধ করি নি, অপরাধীর সঙ্গে বিস্তর নিরপরাধ লোককেও বিনষ্ট করেছি। ধর্মযুদ্ধের আমরা কি জানি? ব্যাসদেবও কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ নিবারণ করতে পরেন নি। আসল কথা, ধর্মযুদ্ধ হতেই পারে না, যুদ্ধ মাত্রেই পাপযুদ্ধ। যে বীর যত শত্রু মারেন তিনি তত পাপী।

পরশুরাম প্রশ্ন করলেন, তুমি কি বলতে চাও আমরা সকলেই পাপী?

—আজ্ঞে হাঁ, ব্যাসদেব ছাড়া। আমাদের মধ্যে শ্রীহনুমান সব চেয়ে কম পাপী, কারণ

উনি শুধু হাত পা আর দাঁত দিয়ে লড়েছেন, বড় জোর গাছ আর পাথর ছুঁড়েছেন। উনি ধনুর্বিদ্যা জানতেন না, দূর থেকে বহু প্রাণী বধ করা ওঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল।

হনুমান বুক ফুলিয়ে বললেন, দৈত্যরাজ, তুমি কিছুই জান না। ধনুর্বাণের কোনও প্রয়োজনই আমার হয় নি, শুধু হাত পা দিয়েই আমি সহস্র কোটি রাক্ষস বধ করেছি।

বিভীষণ বললেন, ওহে মহাবীর পৌরাণিক ভাষা তুমি তো বেশ আয়ত্ত করেছ। পৃথিবীর লোকসংখ্যা এখন মোটে দুশ কোটি, ত্রেতাযুগে ঢের কম ছিল।

পরশুরাম বললেন, বেশ, মেনে নিচ্ছি হনুমান সব চাইতে কম পাপী। সব চাইতে বড় পাপী কে?

বলি বললেন, আজ্ঞে সে হচ্ছেন আপনি। একুশ বার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করেছিলেন, শিশুকেও বাদ দেন নি।

পরশুরাম বললেন, দেখ বলি, পিতামহ প্রহ্লাদের প্রশ্রয় আর বিষ্ণুর অনুগ্রহ পেয়ে তোমার বড়ই স্পর্ধা হয়েছে। আমি বহু দিন অস্ত্র ত্যাগ করেছি, নতুবা তোমার ধৃষ্টতার সমুচিত শাস্তি দিতাম। ধর্মাধর্মের তুমি কতটুকু জান হে দৈত্য? বিষ্ণুক্রান্তা ধরণী থেকে তুমি নির্বাসিত হয়েছে, পাতালে অবরুদ্ধ হয়ে আছ, আজ শুধু আমার অনুরোধে বিষ্ণু তোমাকে দু দণ্ডের জন্য ছেড়ে দিয়েছেন।

বলি বললেন, প্রভু পরশুরাম, আপনি অবতার হতে পারেন, কিন্তু আপনার ধর্মাধর্মের ধারণা অত্যন্ত সেকেলে। ওহে অশ্বত্থামা তুমি তো সমস্ত পৃথিবী পর্যটন করেছ, অনেক খবর রাখ, যুদ্ধ সম্বন্ধে এখনকার মনীষীদের মতামত কি শুনিয়ে দাও না।

অশ্বত্থামা বললেন, বড় বড় রাষ্ট্রের কর্তারা বলেন, আমরা যুদ্ধ চাই না, কিন্তু সর্বদাই প্রস্তুত আছি; যদি বিপক্ষ রাষ্ট্র আমাদের কোনও ক্ষতি করে তবে অবশ্যই লড়ব। পক্ষান্তরে কয়েকজন ধর্মপ্রাণ মহাত্মা বলেন, অহিংসাই পরম ধর্ম, যুদ্ধ মাত্রেই অধর্ম। অন্যায় সইবে না অন্যায়কারীদের প্রাণপণে বাধা দেবে, কিন্তু কদাপি হিংসার আশ্রয় নেবে না। অহিংস প্রতিরোধের ফলেই কালক্রমে বিপক্ষের ধর্মবুদ্ধি জাগ্রত হবে।

পরশুরাম বললেন,কলিযুগের বুদ্ধি আর কতই হবে! ঘরে মশা ইঁদুর বা সাপের উপদ্রব হলে যে গৃহস্থ অহিংস হয়ে থাকে তাকে ঘর ছেড়ে পালাতে হয়। যারা স্বভাবত দুরাত্মা অহিংস উপায়ে তাদের জয় করা যায় না। অক্রোধেন জয়েৎ ক্রোধং এই উপদেশ সদাশয় বিপক্ষের বেলাতেই খাটে। দুর্যোধনকে তুষ্ট করবার জন্য যুধিষ্ঠির বহু চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তাতে ফল হয়েছিল কি? যাঁরা এখন অহিংসার প্রচার করছেন তাঁরা যুদ্ধ থামাতে পেরেছেন কি?

অশ্বত্থামা বললেন, আজ্ঞে না। আমি যে অধর্মযুদ্ধ করেছিলাম তার জন্য কৃষ্ণ আমাকে ত্রিসহস্রবর্ষভোগ্য দারুণ শাপ দিয়েছিলেন। কিন্তু আধুনিক মারণাস্ত্রের তুলনায় আমার ব্রহ্মশির অস্ত্র অতি তুচ্ছ। এখন যাঁরা আকাশ থেকে বজ্রময় প্রলয়াগ্নি ক্ষেপণ করে জনপদ

ধ্বংস করেন, নির্বিচারে আবালবৃদ্ধবনিতা সহস্র সহস্র নিরপরাধ প্রজা হত্যা করেন, তাঁদের কেউ শাপ দেয় না। আধুনিক বীরগণের তুল্য উৎকট পাপী সত্য ত্রেতা দ্বাপরে ছিল না।

বলি মৃদুস্বরে বললেন, ছিল। আমাদের এই জামদগ্ন্য পরশুরাম যে একুশ বার ক্ষত্রিয় সংহার করেছিলেন, নৃশংসতায় তার তুলনা হয় না।

পরশুরামের শ্রবণশক্তি একটু ক্ষীণ, বলির কথা শুনতে পেলেন না। বললেন, বীরের পাপপুণ্য বিচার করা অত সহজ নয়। দুষ্ক্রিয়া যখন দেশব্যাপী হয়, অথবা শ্রেণীবিশেষের মধ্যে অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়, যখন উপদেশে বা অনুরোধে কোন ফল হয় না, তখন ঝাড়ে বংশে নির্মূল করাই একমাত্র নীতি, কে দোষী কে নির্দোষ তার বিচারের প্রয়োজন নেই।

বিভীষণ বললেন, একজন পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত (T.H.Huxley) বলেছেন, নীতি হচ্ছে দুরকম, নিসর্গনীতি (cosmic law) আর ধর্মনীতি (moral law)। প্রথমটি বলে, আত্মরক্ষা আর স্বার্থসিদ্ধির জন্য পরের সর্বনাশ করা যেতে পারে। এই নীতি অনুসারেই লোকে মশা ইদুঁর সাপ বাঘ ইত্যাদি মারে, খাদ্যের জন্য জীবহত্যা করে, লক্ষ লক্ষ কীট বধ করে কৌষেয় বস্ত্র প্রস্তুত করে, সভ্য সবল জাতি অসভ্য দুর্বল জাতিকে পীড়ন বা সংহার করে, যুদ্ধকালে কোনও উপায়ে বিপক্ষকে ধ্বংস করবার চেষ্টা করে। পক্ষান্তরে ধর্মনীতি বলে, স্বার্থসিদ্ধির জন্য কদাপি পরের অনিষ্ট করবে না, সকলকেই আত্মীয় মনে করবে। কিন্তু কেবল ধর্মনীতি অবলম্বন করে কি করে জীবনযাত্রা নির্বাহ করা যায়, স্বার্থ আর পরার্থ বজায় রাখা যায়, তার পদ্ধতি এখনও আবিস্কৃত হয় নি। রাজনীতিক পণ্ডিতগণ অবস্থা বুঝে প্রথম বা দ্বিতীয় নীতির ব্যবস্থা করেন, সাধারণ মানুষও তাই করে। তবে ভবিষ্যদ্‌দর্শী মহাত্মারা আশা করেন যে মানবজাতি ক্রমশ নিসর্গনীতি বর্জন করে ধর্মনীতি আশ্রয় করবে। আমাদের এই ভগবান ভার্গব নিসর্গনীতি অনুসারেই একুশ বার ক্ষত্রিয় সংহার করেছিলেন।

পরশুরাম বললেন, ঠিক করেছিলাম। সাধুদের পরিত্রাণ আর দুস্কৃতদের বিনাশের জন্যই অবতাররা আসেন। তাঁরা চটপট ধর্ম-সংস্থাপন করতে চান, অগণিত দুর্বুদ্ধি পাপীকে উপদেশ দিয়ে সৎপথে আনবার সময় তাঁদের নেই। এখনকার লোকহিতৈষী যোদ্ধারা যদি অনুরূপ উদ্দেশ্যে নির্মম হয়ে যুদ্ধ করেন তাতে আমি দোষ দেখি না।

অশ্বত্থামা বললেন, কিন্তু একাধিক প্রবল পক্ষ থাকলে নিসর্গনীতিও জটিল হয়ে পড়ে। সকলেই বলে অন্যায় উপায়ে যুদ্ধ করা চলবে না অথচ ন্যায়-অন্যায়ের প্রভেদ সম্বন্ধে তারা একমত হতে পারে না। প্রত্যেক পক্ষই বলতে চায়, তাদের যে অস্ত্র আছে তার প্রয়োগ ন্যায়-সম্মত কিন্তু আরও নিদারুণ নতুন অস্ত্রের প্রয়োগ ঘোর অন্যায।

পরশুরাম বললেন, আমাদের মধ্যে আলোচনা তো অনেক হল, এখন তোমরা নিজের নিজের মত প্রকাশ করে বল— ধর্মযুদ্ধের লক্ষণ কি? কিপ্রকার যুদ্ধ এই কলিযুগের উপযোগী? বলি, তুমিই আগে বল।

বলি বললেন, যুদ্ধচিন্তা ত্যাগ করে নিরন্তর শ্রীহরির নাম কীর্তন করতে হবে। কলিতে অন্য গতি নেই।

পরশুরাম বললেন, তোমার বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছে, বামনদেবের তৃতীয় পদের নিপীড়নে তোমার মস্তিষ্ক ঘুলিয়ে গেছে। বিভীষণ কি বল?

বিভীষণ বললেন, যেমন চলছে চলুক না, ধর্মযুদ্ধের নিয়ম রচনায় প্রয়োজন কি। তাতে কোনও ফল হবে না, আমাদের বিধান মানবে কে? অশ্বত্থামা, তোমার মত কি?

অশ্বত্থামা বললেন, তিন হাজার বৎসর শাপ ভোগ করে আমার বুদ্ধি ক্ষীণ হয়ে গেছে, বিচারের শক্তি নেই। আমার পূজ্যপাদ মাতুলকে জিজ্ঞাসা করুন।

কৃপাচার্য বললেন, যুদ্ধের কোন কথায় আমি থাকতে চাই না, আমি আজকাল সাধনা করছি।

হনুমান বললেন, আপনারা ভাববেন না, ধর্মযুদ্ধের নিয়ম বন্ধন অতি সোজা। সেনায় সেনায় যুদ্ধ এবং সর্ববিধ অস্ত্রের প্রয়োগ একেবারে নিষিদ্ধ করতে হবে। দুই পক্ষের যাঁরা প্রধান তাঁরা মল্লযুদ্ধ করবেন, যেমন বালী আর সুগ্রীব, ভীম আর কীচক করেছিলেন। কিন্তু চড় লাথি দাঁত নখ প্রভৃতি স্বাভাবিক অস্ত্রের প্রয়োগে আপত্তির কারণ নেই।

বিভীষণ বললেন মহাবীর, তোমার ব্যবস্থায় একটু ত্রুটি আছে। দুই বীর সমান বলবান না হলে ধর্মযুদ্ধ হতে পারে না। মনে কর, চার্চিল আর স্তালিন, কিংবা ট্রুমান আর মাও-সে-তুং, এঁরা মল্লযুদ্ধ করবেন। এঁদের দৈহিক বলের পাল্লা সমান করবে কি করে?

হনুমান বললেন, খুব সোজা। একজন নিরপেক্ষ মধ্যস্থ থাকবেন, যে বেশী বলবান তাকে তিনি প্রথমেই যথোচিত প্রহার দেবেন, যাতে তার বল প্রতিপক্ষের সমান হয়ে যায়।

বিভীষণ বললেন, যেমন ঘোড়দৌড়ের হ্যান্ডিক্যাপ।

পরশুরাম বললেন, বৎস হনুমান কোনও মানুষ তোমার এই বানরিক বিধান মেনে নেবে না। ব্যাসদেব নীরব রয়েছেন কেন, ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি? ওহে ব্যাস, ওঠ ওঠ।

পরশুরামের ঠেলায় মহর্ষি ব্যাসের ধ্যানভঙ্গ হল। তিনি বললেন, আমি আপনাদের সব কথাই শুনেছি। এখন একটু সৃষ্টিতত্ত্ব বলছি শুনুন। ভগবান স্বয়ম্ভু, কারণবারি সৃষ্টি করে সপ্ত সমুদ্র পূর্ণ করলেন। কালক্রমে সেই বারিতে সর্বজীবের মূলীভূত প্রাণপঙ্ক উৎপন্ন হল যার পাশ্চাত্ত্য নাম প্রোটোপ্লাজ্ম। কোটি বৎসর পরে তা সংহত হয়ে প্রাণকণায় পরিণত হল, এখন যাকে বলা হয় কোষ বা সেল। এই প্রাণকণাই সকল উদ্ভিদ আর প্রাণীর আদিরূপ। তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নেই কিন্তু চেষ্টা আছে, অন্তর্লীন আত্মাও আছে। আরও কোটি বৎসর পরে বহু কণার সংযোগের ফলে বিভিন্ন জীবের উদ্ভব হল, যেমন ইষ্টকের সমবায়ে অট্টালিকা। প্রাণকণার যে পৃথক প্রাণ আর আত্মা ছিল জীবশরীরে তা সংযুক্ত হয়ে গেল। ক্রমশ জীবের

নানা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ইন্দ্রিয়াদি উদ্‌ভূত হল কিন্তু বিভিন্ন অবয়বের মধ্যে বিরোধের সম্ভাবনা রইল না, কারণ সর্বশরীরব্যাপী একই প্রাণ আর আত্মা তাদের নিয়ন্তা।

পরশুরাম বললেন, ওহে ব্যাস, তোমার ব্যাখ্যান থামাও বাপু, আমি তোমার শিষ্য নই।

ব্যাস বললেন, দয়া করে আর একটু শুনুন। কালক্রমে জীবশ্রেষ্ঠ মানুষের উৎপত্তি হল তারা সমাজ গঠন করলে। ইতর প্রাণীরও সমাজ আছে, কিন্তু মানবসমাজ এক অত্যাশ্চর্য ক্রমবর্ধমান পদার্থ। বিভিন্ন মানুষ কামনা করছে— আমরা সকলে যেন এক হই। এই কামনার ফলে সামাজিক প্রাণ আর সামাজিক আত্মা ধীরে ধীরে অভিব্যক্ত হচ্ছে, ব্যষ্টিগত ক্ষুদ্র স্বার্থের স্থানে সমষ্টিগত বৃহৎ স্বার্থের উপলব্ধি আসছে। কিন্তু সৃষ্টির ক্রিয়া অতি মন্থর, একত্ববোধ সম্পূর্ণ হতে বহুকাল লাগবে। তার পর আরও বহু কাল অতীত হলে বিভিন্ন মানব-সমাজও একপ্রাণ একাত্মা হবে। তখন বিশ্বমানবাত্মক বিরাট পুরুষই সমস্ত সমাজ আর মানুষকে চালিত করবেন, অঙ্গে অঙ্গে যেমন যুদ্ধ হয় না সেইরূপ মানুষে মানুষে যুদ্ধ হবে না।

পরশুরাম প্রশ্ন করলেন, তোমার এই সত্যযুগ কত কাল পরে আসবে?

—বহু বহু কাল পরে। তত দিনে মানবজাতির বিরোধ নিবৃত্ত হবে না। কিন্তু লোকহিতৈষী মহাত্মারা যদি অহিংসা আর মৈত্রী প্রচার করতে থাকেন তবে তাঁদের চেষ্টার ফলে ভাবী সত্যযুগ তিল তিল করে এগিয়ে আসবে। এখন আপনারা নিজ নিজ স্থানে ফিরে যান, দশ বিশ হাজার বৎসর ধৈর্য ধরে থাকুন। তারপর আবার এখানে সমবেত হয়ে তৎকালীন অবস্থা পর্যালোচনা করবেন।

পরশুরাম বললেন, হুঁ, খুব ধূমপান করেছ দেখছি, দশ-বিশ হাজার বৎসর বলতে মুখে বাধে না। ও সব চলবে না বাপু। আমি এখন বিষ্ণুর কাছে যাচ্ছি। তাঁকে বলব, আর বিলম্ব কেন, কল্কিরূপে অবতীর্ণ হও, ভূভার হরণ কর, পাপীদের নির্মূল করে দাও, অলস অকর্মণ্য দুর্বলদেরও ধ্বংস করে ফেল, তবেই বসুন্ধরা শান্ত হবেন। আর, তোমার যদি অবসর না থাকে তো আমাকে বল, আমিই না হয় আর একবার অবতীর্ণ হই।